নির্বাচিত প্রবন্ধ

সুধীর চক্রবর্তী

পুনশ্চ

আত্মপক্ষ

ঘটনাচক্রে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হল এবং আশ্চর্য সমাপতন যে এ-বছরই প্রস্তুত করা গেল আমার 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'-র পাণ্ডুলিপি। এ ব্যাপারে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব নামী প্রকাশক 'পুনশ্চ'-র কর্ণধার শ্রীযুক্ত শঙ্করীভূষণ নায়ক, তাঁর পুত্র শ্রীমান সন্দীপ নায়ক ও শ্রীমান সপ্তর্ষি নায়ককে। মাস ছয়েক আগে এই 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' প্রকাশে তাঁদের আগ্রহের কথা জানালেও আমার গড়িমসিতে কাজটা তেমন এগোয়নি। এই দীর্ঘসূত্রিতার একটা প্রধান কারণ নিজের প্রবন্ধ নিজে নির্বাচনের শ্রম ও বিবেচনাবোধের অনীহা। কাজটা আরেকদিকে কঠিন হল এই জন্য যে প্রায় দুশো মতন মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে ঝাড়াই বাছাই করে বত্রিশটি লেখাকে সন্নিবেশিত করা। এখানে সেই কঠিন কাজটি পরিবেশিত হচ্ছে অসহায় অতৃপ্তিবোধসহ।

প্রবন্ধগুলিকে পাঁচটি স্বতন্ত্র গুচ্ছে বিন্যস্ত করে সাজানো হয়েছে। ১. জনসংস্কৃতি ও লোকধর্ম, ২. সাহিত্য, ৩. গান, ৪. সমাজ ও ব্যক্তিত্ব, ৫. বিচিত্র। আশা করা যায় পাঠক ও গুণগ্রাহীরা এসব রচনায় আমার নানাচারী ভাবনাকে খুঁজে পাবেন। আগ বাড়িয়ে নিজের আত্মপক্ষে বলা ভালো, প্রবন্ধ বলতে যে সারবান, কাঠিন্য যুক্ত, গম্ভীর রূপবন্ধের কথা অনেকে ভাবেন আমার লেখনী তাতে কোনোকালেই উৎসাহী নয়। আমি বরং প্রবন্ধের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে তার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন রসের ধারা বহাতে আগ্রহী। শেষবিচার তো পাঠকের হাতে।

লেখাগুলির বিন্যাসে বিষয়গত দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, তার প্রকাশগত কালক্রম নয়। তবে 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' বইয়ের সবকটি রচনাই পূর্বপ্রকাশিত এবং আমার নানাধরনের বই থেকে নেওয়া। কোন্‌টি কবে লেখা বা সে লেখাটি কোন্ বইতে আছে এমন শুষ্ক তথ্য বিতরণে আমি সচেতন ভাবেই অপারগ। তবে এখানে এই সংকলনে ছাপার আগে একটি দুটি লেখায় সামান্য শল্যচিকিৎসা করেছি। নানা লেখায় ছড়ানো ছিটানো কোনো কোনো তথ্য বা উদ্ধৃতির পুনরুক্তি থেকে গেল। সেগুলি শল্য চিকিৎসার পক্ষে অসাধ্য।

আশাকরি 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

জনসংস্কৃতি ও লোকধর্ম

জনসংস্কৃতি ১৩

সন্ত কবিরের বাচনিক ভাষ্য ২৯

লোকায়তের অন্তরমহল ৩৭

লোকধর্ম ও লোকসমাজ ৫৫

বাংলা দেহতত্ত্বের গান ৭৩

যেথায় থাকে সবার অধম ১০৫

বাঙালির গৌণ ধর্মচর্চার ইতিহাস ১২০

সাহিত্য

কলেজীয় কবিদের কথা ১৫১

আত্মবৃত্তান্তের অন্যমুখ ১৫৮

নীলনলিনীর কথা ও কবিতা ১৬৫

লোকায়তের চারিত্র্য মূর্তি ১৭৮

স্বনির্বাসী লেখক ১৯৩

আর্ত কবিতার কথকতা ২০৩

এক প্রাণবন্ত ভাস্কর্য ২১৭

গান

পুরনো কলকাতার গান ২৩১

গানের ভিতর দিয়ে ২৪৬

রবীন্দ্র সংগীত : বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব ২৬০

গানের চেহারা ২৭৯

বাংলা গানে দেহের দেহলি ৩০২

গওহরজান থেকে মৌসুমী : বাংলা গানের নারী-কথা ৩১৮

দেবব্রত বিশ্বাসের গান ৩২৪

গুপী গাইনের গান ৩৩২

সমাজ ও ব্যক্তিত্ব

অভাবেরই অভাব ৩৪৭

পিতৃপ্রতিম তাপ ৩৬১

বিচিত্র বিদ্যার সন্ধিৎসু ৩৭২

অলৌকিক কিন্নর ৩৭৮

স্মরণ সাগর ধারে ৩৮৯

বিচিত্র

নানাভাষা একদেশ ৪০৫

দগ্ধস্তূপ রবিশস্য ৪০৯

সর্বংসহ রবীন্দ্রনাথ ৪১৪

ভালো আমার লেগেছিল ৪২৩

সুরসাধকের প্রেম — শোপাঁ, ব্রাহম্‌স, চাইকফস্কি ৪৩৫

জনসংস্কৃতি
ও
লোকধর্ম

জনসংস্কৃতি

বাংলার সর্বাধিক প্রচারিত যে দৈনিকপত্র তাতে সম্প্রতি একটি লেখায় দেখলাম বলা হচ্ছে যে পপুলার সংস্কৃতির একজন প্রতীক হচ্ছেন শংকর। সাহিত্যিক শংকর। লেখাটার মধ্যে বারবারই পপুলার সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে। তার মানে পপুলার কালচার, যে কথাটা আমরা এখন খুব শুনছি উত্তর আধুনিক কালে। আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন কালচার-এর সংজ্ঞা নিয়ে বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে এমন কোনো বিভাজনের কথা শোনা যায় নি। হাই কালচার, লো কালচার, পপুলার কালচার। সংস্কৃতি নিয়ে গোপাল হালদার বেশ দীর্ঘ কাজ করেছিলেন—*সংস্কৃতির রূপান্তর*। কিন্তু ক্রমশ যত দিন যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে যত চিন্তা আসছে নতুন নতুন, পুরনো ধারণাগুলো যত পালটাচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে সংস্কৃতি চিন্তারও কিছু কিছু নতুন সংজ্ঞায়ন হচ্ছে।

পপুলার কালচারের ঠিক কী বাংলা করা যায়? কোনোরকম সুবিধে করতে না পেরে পপুলার সংস্কৃতি বলা হচ্ছে। যদি ভাবা যায় একটা উচ্চতর সংস্কৃতি আছে আমাদের শিক্ষিত বিদগ্ধ উচ্চসমাজে আর একটা আছে লোকসংস্কৃতি, যার সঙ্গে গ্রামের যোগ আছে। গ্রামীণ প্রবহমান সংস্কৃতি। যাতে কালের স্পর্শ কম। কালের পরিবর্তমানতা কম। তাই বলে চিরকাল অচল অটল লোকসংস্কৃতি একথা বলা যাবে না। লোকসংস্কৃতির মধ্যেও দেওয়া নেওয়া আছে। চলাচল আছে। কিন্তু 'লোক' বা 'ফোক' বলতে অপর এর সমাজকে যদি বলি 'সোসাইটি', সমাজবিজ্ঞানীরা আরেকটাকে বলেছেন 'কমিউনিটি'। 'কমিউনিটি'র মধ্যে একটা অন্যরকম চিহ্ন আছে। যেমন ধরা যাক গ্রামের মানুষ, তাদের যে জীবনযাপন তার সঙ্গে শহরের জীবনযাপনের গুণগত এবং অর্থনীতিগত পার্থক্য আছে। কিন্তু যাপনগত পার্থক্যটা একটু বেশিই। একজন গ্রামীণ মানুষ জন্মাবার পর তার সেই গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কিছুই স্বভাবতই জেনে যায়। যেমন জলের কথা জানে, নৌকোর কথা জানে, পশুদের দেহসঙ্গম আর সন্তান হওয়া সচক্ষে দেখতে পায়। নদীর কথা জানে, মাঝিমাল্লার কথা জানে, চারপাশের খুঁটিনাটি ঋতুপ্রকৃতির অদলবদলের আনুষঙ্গিক সূক্ষ্ম খবর তারা জানে। তাদের মধ্যে দারিদ্র্য আছে, আবার আনন্দও আছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধেবেলা বা রাত্রিতে তাঁরা সমবেত হতে পারেন। গান গাইতে পারেন, নাচতে পারেন এবং তাঁদের সৃজনের উৎসধারা তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে

নেন। নিতেন বললেই ভালো হয়। কেননা এখন তাতে রসরঙ্গের টান পড়েছে। শহরের ভোগবাদী জীবন তাঁদের প্রভাবিত করছে। তাঁদের গ্রামীণ জীবনের যে স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্ব আয়োজন তাতে এসে পড়েছে নাগরিক টান। শহর এবং গ্রামের মধ্যে বিভেদ অনেক কমে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট হয়েছে। মানুষ ইচ্ছে করলেই চট করে শহরে চলে যান। কেনাকাটা করতে, ডাক্তার দেখাতে। এমনকী কলকাতা শহরও অনেকের দেখা হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা গ্রামের স্কুলেই পড়তে পাচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দূরদর্শনের একটা বিশ্বায়িত ঝোঁক। এতে 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু' এই যে ব্যাপারটা, সারা পৃথিবীর দৃশ্যকলার এবং ভাবনা চিন্তার প্রভাব, পোশাক আশাক, স্টাইল এবং নানারকমের নাচগান কুইজ প্রতিযোগিতার খবর, সিনেমার কল্পলোকের চাবি খোলার ক্ষমতা সব তাঁদের করায়ত্ত হয়ে যাচ্ছে।

ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতি যে নিজস্ব বুনিয়াদ তাতে একটু ফাটল ধরেছে। সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির নিজস্ব বুনিয়াদের উপর যে সৌধ গড়ে উঠেছে এখন তাতে আরো কয়েকটা মোহ তৈরি হচ্ছে যা চরিত্রে সম্পূর্ণ গ্রামীণ নয়। কিছু নাগরিকতার মিশেল, কিছু বিকৃতি, কিছু অন্য ভাবনার ছোঁয়া এসে পড়ছে। কিন্তু সত্যিকার যেটা কমিউনিটি, যেখান থেকে লোকসংস্কৃতির জন্ম, সেখানে কতকগুলো বিশ্বাস, কতকগুলো প্রচলিত ধ্যানধারণা সংস্কার কিন্তু অনেকটা রয়েই যায়। সেগুলো যাঁরা অনুধাবন করছেন, যেমন সমাজবিজ্ঞানীরা, তাঁরা লক্ষ করছেন যে, এখনকার লোকজীবনে একটা দোটানার ভাব দেখা যাচ্ছে।

এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে যে গ্রামজীবন দেখছি সেখানে এরকম দৃশ্য আমার মনে আছে যে, একটি ছোটো মেয়ে দোকানে এসে বলছে যে 'এক কেজি চাল দিন'। চালটা নেওয়ার পর সে তার গামছা থেকে খানিকটা তিসি, সরিষা জাতীয় শস্য দোকানিকে দিচ্ছে। প্রায় দুকেজি তিসির বিনিময়ে এককেজি চাল নেওয়ার এই যে বিনিময় পদ্ধতি এখন হয়তো আর গ্রামে গেলে দেখা যাবে না। কারণ গ্রামের মানুষের হাতে এখন টাকা এসে গেছে। এই বিনিময় প্রথা এখন আর গ্রামে নেই, কিন্তু আমি দেখেছি। আমার বাপ দাদারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই যে বিনিময় প্রথা বা বিনিময়-প্রবণতা এটা গ্রামীণ জীবনের একটা লক্ষণ। যেমন নৌকো চড়ে একজন মানুষ পার হয়ে গেল। কিন্তু নৌকো চড়ার জন্য কিছু দিল না। মাঝি জানে যে, ও লোকটা পরে কিছু দিয়ে দেবে। হয়তো লোকটা ছুতোর কিংবা কামার। তার কাছে গিয়ে মাঝি যখন বলবে, 'একটা দা বানিয়ে দাও কিংবা কুড়ুল বানিয়ে দাও', সে দেবে। বিনিময়ে হয়তো বেশ কয়েকবার নৌকো-যাত্রা ঘটে যাবে। এইরকম ভাবে কুমোরের সঙ্গে কামারের, গোয়ালার সঙ্গে মাঝির, চাষির সঙ্গে জেলের বিনিময়ধর্মিতা। পরস্পরের শিল্পকে পরস্পরের তৈরি দ্রব্যকে তারা চিনত, তারা নির্ভর করত। ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনা হল তার মানে যে তক্ষুনি পয়সা দেওয়া হল এমন কোনো কথা নেই। সবসময় তো কাঁচা পয়সা গ্রামীণ মানুষের হাতে থাকত না। ফলে এই পারস্পরিক লেনদেন হয়েই চলছিল। কেউ তার চুলচেরা ভাগ নিয়ে বিতর্ক করেনি কখনো। এইভাবেই গ্রামে পুজো হত, উৎসব হত। বাউল গান হত, কথকতা হত। এখনো হয় অনেক জায়গায়। উত্তরবঙ্গে, মুর্শিদাবাদের গ্রামে দেখেছি এখনো হচ্ছে। জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষে সারারাত্রি তরজা গান হচ্ছে, কবিগান হচ্ছে এবং মানুষ আনন্দ পাচ্ছে। লোকায়ত বিনোদনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ করছি। এই যে নির্মাণ সেটা অনেক সময় নাগরিক সমাজে ঘটে না অন্য অর্থে।

ধরা যাক, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল যাঁরা গড়েন তাঁরা দো-আঁশ মাটি দিয়ে পুতুল গড়েন। 'দো-আঁশ' মাটির মধ্যে এমন একটা নমনীয়তা আছে যাতে খুব সূক্ষ্ম কাজ করা যায়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলগুলো খুব বাস্তবধর্মী, তাতে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ আছে— জেলে, কাঠুরে, কামার, বেদে, বাউল-এর মূর্তি। চারপাঁচ ইঞ্চি থেকে দশবারো ইঞ্চি পর্যন্ত হিউম্যান ফিগারগুলো তৈরি হয়। তার নাক থেকে শুরু করে হাতপায়ের আঙুলগুলো এত নিখুঁত যে দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আর্টের এই যে বাস্তবধর্মিতা (অনেকে অবশ্য একে আর্ট না বলে ক্রাফ্‌ট্ বলেন) তার মূলে রয়েছে অনেকদিনকার কতকগুলো পরিবারের পরম্পরাগত শিল্প-কৌশল এবং মাটির নিজস্ব চরিত্র। দো-আঁশ মাটির জন্যই এটা করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায়, যেখানে ঘাড়লম্বা ঘোড়াগুলো তৈরি হয়, যেগুলো আমরা গৃহসজ্জায় ব্যবহার করি, সেখানে গেলে দেখা যাবে দো-আঁশ মাটি নেই, মাটির মধ্যে বালির ভাগ খুব বেশি। ফলে ঐ বাঁকুড়ার মাটির রুক্ষতায় কৃষ্ণনগরের শিল্পকৌশল আনা কঠিন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাঁকুড়ার শিল্পীরাই বাস্তব ভেঙে এমন এক শিল্পরূপ তৈরি করেছেন, ঘোড়া বা হাতি, যা ছাঁচভাঙা মৌলিকতার বড়ো প্রমাণ। মস্তবড়ো লম্বা গলা, ঘোড়ার মূর্তিটাকে তাঁরা ভেঙেছেন লোকায়ত কল্পনায়। এই ভাঙার ব্যাপারটা কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা ঠিক একদম যেমন দেখছেন ঠিক তেমনই করতে অভ্যস্ত। এখন তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যদি কৃষ্ণনগরের তরুণ কৌশলী শিল্পীকে বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায় নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুদিন রাখা যেত, আর বাঁকুড়ার তরুণ শিল্পীকে যদি কৃষ্ণনগরে এনে রাখা হত মাসকয়েক, পারস্পরিক লেনদেন হলে এইটা হত যে, বাঁকুড়ার মূর্তির মধ্যে কৃষ্ণনগরের মূর্তির সূক্ষ্মতা হয়তো কিছু আনা যেত। আবার কৃষ্ণনগরের শৈলীর মধ্যে অতি বাস্তবতার ছকটা ভেঙে একটা লোকায়ত ঢং হয়তো আসতে পারত। কথা উঠতে পারে মাটি কোথায় পাওয়া যাবে? মাটি আনা যাবে। মাটিও লেনদেন করা যায়। পরিবহনের ব্যবস্থা আছে তো। কিন্তু বদ্ধ গ্রামীণ সমাজে, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষে, বাংলায় এই লেনদেনের কথা ভাবাই যায়নি। বাঁকুড়ার গ্রামের কোনো শিল্পী কৃষ্ণনগরের শিল্প দেখার সুযোগই পান না। এখন নানারকম প্রদর্শনী হয়। কলকাতায়, দিল্লিতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিল্পীরা সব যান, দেখাশোনা হয়, বিনিময় করেন তাঁরা পরস্পর পরস্পরের ঠিকানা। এখন অনেক যাতায়াত হচ্ছে, ফলে একটা মিশ্র সংস্কৃতিও তৈরি হতে পারে।

কিন্তু কথা হচ্ছে পপুলার কালচার নিয়ে। উচ্চ সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি আর মাঝখানে রয়েছে এই পপুলার কালচার যাকে আমরা (ভয়ে ভয়ে) নাম দিচ্ছি জনসংস্কৃতি। কিন্তু জনপ্রিয় সংস্কৃতি নয়, জনসংস্কৃতি বলতে আমরা মনে করছি আমাদের মতো মরমি মানুষজন যারা শিক্ষিত ও রসিক, নগর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবধান ঘোচাতে আগ্রহী, মানুষের সমাজে সাম্যবাদে বিশ্বাসী, যাঁরা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোনো বিভাজন রাখতে চান না, শুধু অর্থনীতিগত নয়, শ্রেণিগত, সমাজগত সুযোগ সুবিধার কথা যাঁরা ভাবছেন, আমাদের এই যে সংস্কৃতিচর্চা সেটাকে জনসংস্কৃতি বললে ক্ষতি কি? রবীন্দ্রনাথকে অনেকে উচ্চসমাজের প্রতিনিধি ভেবেছেন। একটা সময় তিনি উচ্চ সমাজের প্রতিনিধিই ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধর হিসেবে তিনি অভিজাত সমাজেরই মানুষ। কিন্তু একটা সময় তাঁর এই নিগড়টা যখন ভেঙে গেল যৌবনের একটা পর্যায়ে, যখন তাঁর বিবাহ হয়েছে, সন্তান হয়েছে, সেইসময় ঠাকুরবাড়ির জমিদারী পরিচালনা করার জন্য উত্তর মধ্যবঙ্গের শিলাইদহ, কালীগ্রাম, পতিসর,

সাহজাদপুর এইসব জায়গার পদ্মাবিধৌত গ্রামে গিয়ে যখন গ্রামজীবনের মধ্যে পৌঁছলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন তাঁর সেই অভিজাত, উচ্চ সংস্কৃতিজাত মন পেল একটা নতুন প্রবর্তনা, নতুন সম্ভাবনা। একটা শ্যামল গ্রামীণ জীবনের সহজসরল বিন্যাসে তিনি অভিভূত হলেন মানুষের জীবনযাত্রা দেখে। কষ্ট পেলেন তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য দেখে। কবিতায় তাই ঘোষণা করলেন, 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা/এইসব ক্লান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'। তেমনি ভেতরে ভেতরে তাদের পল্লিজীবনের গানের সুর, লোকায়ত সুর, বাউলের সুর, ভাঙাকীর্তন, ঢপকীর্তনের সুর তিনি আহরণ করলেন। রবীন্দ্রসংগীত বলে যে 'জঁর', তার ভিতরে আমরা লক্ষ করি ভারতীয় হিন্দুস্থানি, মার্গসংগীতের প্রভাব, আর বিলিতি গানের কিছু চলন যা তিনি আয়ত্ত করে ছিলেন, ইংরেজি, স্কচ, আর আইরিশ গান থেকে। তেমনি তাঁর নিজস্ব গানের বুননে আর একটি উপাদান বাংলার লোকজ সুর। সেইখানেই আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ জনসংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন। অভিজাত মনন তার সঙ্গে লোকায়ত দীক্ষা তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন নিয়ে এল, তার থেকে তিনি যে গান লিখলেন, স্বদেশি যুগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় সেই একুশখানি গানের মধ্যে আছে এই জনসংস্কৃতির চিহ্ন যা শুনে আমরা চমকে যাই। 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'— এই গানের যে বাংলার হৃদয় থেকে একটা উৎসারণ তা রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম সঞ্চারিত হল। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'— এই উচ্চারণের মধ্যে তাঁর কোনো কৃত্রিমতা ছিল না এই সোনার বাংলাকে তিনি তো সত্যিই আবিষ্কার করলেন। কাজেই এটাকে এখন আমরা জনসংস্কৃতির একটা অভিন্ন অঙ্গ বলেই মনে করি। রবীন্দ্রনাথের গান এখন যে শুধু শিক্ষিত বিদ্বৎজনের, অভিজাত জনের বিনোদন তা নয়। রবীন্দ্রসংগীত এখন আমরা সবাই গাইছি এবং আমাদের মধ্যবিত্ত চেতনার যে উন্মেষ, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ভাবনা, তার ভিত্তিমূলে রবীন্দ্রনাথের গান, গীতবিতানের বাণী একটা খুব বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। এটা নিশ্চয় জনসংস্কৃতির উদ্ভাস।

সেইরকমভাবেই লক্ষ করি যে, নদিয়ার চাপড়ায় প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের একটা চমৎকার পরিবেশ পরিসর আছে। তাঁরা নিম্নবর্গের হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে একদা খ্রিস্টান হয়েছিলেন। সেই প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের যে পরম্পরা তা হয়তো তিন-চার প্রজন্ম পার হয়েছে। তাদের ওখানে খ্রিস্টীয় কীর্তন বলে একটা বস্তু আছে। এই খ্রিস্টীয় কীর্তন যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা খ্রিস্টান হলেও নবদ্বীপে গিয়ে কীর্তনের যে-রূপবন্ধ তাল, তার যে-তান এবং তার যে-আখর আয়ত্ত করেছিলেন, নিজেদের খ্রিস্টবিষয়ে গান রচনায় তাঁরা সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন। এটা জনসংস্কৃতির মস্ত বড়ো উদাহরণ বলে মনে করি। আমাদের কৃষ্ণনগর শহরে ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা আছেন, যাঁরা পৌত্তলিক। একমাত্র কৃষ্ণনগরে, নবদ্বীপে শান্তিপুরে একটা বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ আছে বলে যার জন্যে এখানে ঝুলন বলে একটা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান হয়। বাড়িতে বাড়িতে 'ঝুলন' উপলক্ষে মাটির পুতুল দিয়ে, ঘাস দিয়ে নানারকমভাবে একটা কৃত্রিম জনপদ তৈরি করা হয়, যেখানে পাহাড় থাকে, পাহাড়ের উপর শিব থাকেন। রাস্তাঘাট, নদীনালা সবই তৈরি করা হয় কৃত্রিমভাবে। ঝুলন একটা বেশ উপভোগ্য দেখার মতো দৃশ্য বটে। এটা এতদিন ছিল আমাদের হিন্দু সমাজেরই একচেটিয়া। কৃষ্ণনগরের ক্যাথলিক জনমণ্ডলীর মনে হল এরকম ঝুলন তাঁরাও তো করতে পারেন। ফলে বড়োদিনের সময় যিশুর জন্মের যে-মিথ—

সেটাকে অবলম্বন করে এঁরা গোশালা তৈরি করেন। তাতে দেখা যায়, গোশালায় যিশু জন্মেছেন— আকাশে দেখা যাচ্ছে নতুন তারা, যিশুর মা মেরি, বাবা যোসেফ, ভক্তমণ্ডলি, কতকগুলি ভেড়া এবং একটা বিদেশি পরিবেশও তার মধ্যে আছে, কারণ মূলে বিদেশি ছবি দেখেই এই সমস্ত জিনিস তৈরি হয়েছে। ছোটো ছোটো পুতুল দিয়ে তাঁরা যে গোশালা বানান তা ঠিক হিন্দুদের ঝুলনের মতো। এই যে ধারণাটা তাঁরা নিয়েছেন, ভাবের বিনিময় হয়েছে এটা একটা জনসংস্কৃতির সংকেত। আর্টের জনপ্রিয় উপাদান নিয়ে একটা দেখে আর একটা জিনিস করা, পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কত নতুন জিনিস তাঁরা আমাদের দিচ্ছেন।

বাউলদের গান যখন শুনতে যাই তখন লক্ষ করি তাঁদের পোশাকটা। সত্যিকার দরবেশি বাউল যারা, নানাধরনের চিন্তাভাবনার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে, তাই অনেক ধরনের তালি তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা তাঁরা আগে পরতেন। এখন সব গেরুয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যখন কাজ করেছি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে তখনও এই ধরনের তালি তাপ্পি মারা পোশাক, আলখাল্লা যাকে বলে, সেইটা পরে বাউল ফকিরদের নাচতে দেখেছি। এই যে বিভিন্ন ছোটো ছোটো কাপড় নিজে হাতে সেলাই করে (কোলাজের মতো কেউ কেউ বলেন) এটা নাকি আসলে নানারকম মতেরই সম্মিলন। টুকরো টুকরো কাপড়ের মধ্যে দিয়ে নানারকম ধারণাকে একত্র করা। সত্যিকার যাঁরা খাঁটি বাউল তাঁদের কাছে শুনেছি তাঁরা বলেন যে, এক কান দিয়ে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি কিন্তু আর একটা কান আমরা খোলা রেখেছি। গুরু যা শিখিয়েছেন— দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু— তারপরেও সারা জীবনই আর একটা কান খোলা রাখা উচিত। তার কারণ, আরো অনেক মতবাদ আছে, আরো অনেক চিন্তাভাবনা আছে, আরো অনেকেরই উপদেশ আছে, সেইগুলো আর এক কান দিয়ে যদি গ্রহণ করতে পারি তবে সত্যিটা জানতে পাব।

অর্থাৎ একটা মিশ্রণের কথা তাঁরা বলছেন। ভাব চিন্তা তত্ত্বের মিশ্রণ— কোনো কিছুই অখণ্ড অনন্ত নয়। অনবরতই লেনদেন চলছে, পৃথিবী পালটাচ্ছে। তার ফলে বাউল ফকিরদের মধ্যে লক্ষ করেছি এই সমন্বয়বাদ, এই গ্রহিষ্ণুতা।

জনসংস্কৃতির একটা অংশ হচ্ছে ধর্ম, আর একটা অংশ হচ্ছে শিল্প। ধর্মের মধ্যে আবার হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম এসব ভাগ। যেমন ধরা যাক, মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে বিয়ের গান যাঁরা করেন তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে খুবই পিছিয়ে পড়া কিছু মহিলা। তাঁদের কাছে সবসময় উপযুক্ত বাদ্যবাজনাও থাকে না। তাঁরা তাই মুড়ির টিন বাজিয়ে বা গৃহস্থালির টুকরো-টাকরা থালাবাটি বাজিয়ে অনেক সময় বিয়ের গান করেন। বিয়ের গান যাঁরা করতে আসেন তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে বিয়েবাড়িতে তিনচারদিন থাকেন। ওই মহিলারা সারাবছরই তেমন খেতে পান না। এইসময় তাই তাঁদের পেটপুরে একটু খাওয়াদাওয়া জোটে। বিয়েবাড়িতে গৃহস্থালির কাজও তাঁরা করে দেন। যেমন, বাসনকোসন মাজা, বাচ্চাদের স্নান-পায়খানা করানো বা অন্যান্য ভারিভারি কাজ এগুলোও তাঁরা করেন। আবার বিয়ের গানও করেন। এই বিয়ের গান করা কিন্তু শরিয়তি মুসলমান সমাজের কাছে নিষিদ্ধ একটা বিষয়। কারণ গান জিনিসটা ইসলামি শাস্ত্রমতে গাওয়া অন্যায়। কিন্তু মাঝখানে সাবলীল জনসংস্কৃতির চাহিদা আছে। কারণ অতখানি কট্টর মনোভাব সাধারণ সংসারী মানুষের মধ্যে থাকে না। তাঁরা ভাবেন ছেলের বিয়ে হচ্ছে বা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, চারিদিকে এত হই-চই তার মধ্যে বিয়ের গানও একটু হোক না। তাই কিছু কিছু মহিলা এসে ওই বিয়ের গান করেন। মুসলিম সমাজ তাঁদের খুব উঁচু চোখে দেখে না। আগে তাঁদের